Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.106-114
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সম্প্রীতি ও সংকটে জনজাতি ও বাঙালি:প্রসঙ্গ ত্রিপুরার বাংলা কবিতা

ড. রূপশ্রী দেবনাথ
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম, ভারত

Abstract:
There is no lack of panoromic beauty though Tripura may be small in size and surrounded by forest and hillocks in the North-East region of India. Different Tribes and Bengalees have been living side by side since the time of the Kings.Cultural communication have taken place due to long time living together. Gradually, cultural exchange has been noticed and that amalgamation still discernible in the state.
After the independence in 1947,the Bengalees of East Pakistan started entering into Tripura like flow of water. Once, calm and silent Tripura became much Violent.With the entrance of the Bengalees, a huge commotion takes place in the lives of the so called Jhum dependent Tribes. The population of the State gets divided into two groups, one is the Bengalees and the other is the Tribals. As a result, a strong relationship grew up between the Tribes of the forest and the Bengalees of the Plains.With the exchange of Heart and Soul, there has been an endeavor to create a Society with Communal harmony. In spite of that, in the succeeding years especially, in the 1980's the kinship between the Tribes and the Bengalees got breached which once turned into chaotic condition. In the relevant research paper, the various side's of the different of Tribes and Bengalees will be observed carefully.
Keywords: Tripura, Poetry, Tribles, Bengalees, Love, Conflict.

উত্তরপূর্ব ভারতের অরণ্য-পাহাড় বেষ্টিত ত্রিপুরা রাজ্য আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পূর্বে অর্থাৎ রাজ আমলে ত্রিপুরার জনজীবনের গতি-প্রকৃতি ছিল শান্ত স্নিগ্ধ। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল মন্থর গতিহীন। আধুনিকতার ছোঁয়া তখনো এ রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েনি। তখন রাস্তা ছিল মোরামের, গ্যাসের বাতি জ্বলতো আর যানবাহন বলতে ছিল ঘোড়ার গাড়ি। জানা যায় বুনো হাতি নামতো শহরে। বৃহত্তর ভারতবর্ষের বুকে ঘটে যাওয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, বিলিতি দ্রব্য পোড়ানো, কালোবাজারি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদির তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি রাজ আমলের ত্রিপুরায়।

রাজ আমল থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে বহুদলে বিভক্ত জনজাতি ও বাঙালি পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নানা সময়ে নানা পথে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে কেউ থেকে গেছে, কেউ বা গেছে ফিরে। দীর্ঘ সময় পাশাপাশি অবস্থানের ফলে জাতি-জনজাতির মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব-

বিনিময় ঘটেছে। ধীরে ধীরে ঘটেছে সংস্কৃতির মিশ্রণ। সেই মিশ্র সংস্কৃতির ধারা আজও এ রাজ্যে বহমান। আসলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষই আজ মিশ্রজাতি। আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও অনবদ্য মিশ্রণ রয়েছে। আর ভারতবর্ষে মানবজাতির মিশ্রণ চলছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে, ফলে এদেশের মৌলিক সাংস্কৃতিক ধারাটিই হলো মিশ্র প্রকৃতির।

১৮৭১ সালে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে এ ডবলু বি পাওয়ার ত্রিপুরার প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৭২ সালে ত্রিপুরায় প্রথম লোকগণনার কাজ হয়েছিল।[১] যদিও সেই গণনার কাজ প্রশাসকদের মন:পুত হয়নি। ফলে দ্বিতীয়বার লোকগণনা হয়। ১৮৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায় ত্রিপুরার মোট লোকসংখ্যা ছিল তখন ৭৪ হাজার ২৪২ জন। এর মধ্যে জনজাতি ৫৭ শতাংশ আর বাঙালি, মণিপুরি ও অন্যান্য মিলে ৪৩ শতাংশ। জনজাতি মানুষের সংখ্যা ৪২, ৩৪৫ জন, আর অন্যান্যরা ৩১,৮৯৭ জন। মাত্র হাজার দশেকের ব্যবধান। দেখা যাচ্ছে, দেশভাগের আগে সুদূর রাজ আমল থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালি বসবাস করে আসছে।

ত্রিপুরার রাজারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিজের মাতৃভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে দিয়েছিলেন রাজভাষার মর্যাদা। পঞ্চদশ শতকের বিদ্যোৎসাহী রাজা ধর্মমাণিক্য সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁরই শাসনকালে বাংলা ভাষায় রাজমালা গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। রাজা প্রথম রত্নমাণিক্য (১৪৬৪-৮৮) তাঁর আমলে চার হাজার বাঙালি পরিবারকে ত্রিপুরায় বসতির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন, নিযুক্ত করেছিলেন শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন পদে। বংশ পরম্পরায় ত্রিপুরার রাজারা বাঙালি-হিন্দু সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ফলে রাজ আমল থেকেই এই রাজ্যের সংস্কৃতির ধারা মিশ্র প্রকৃতির।

(দুই)

ঐতিহাসিক কারণে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ববাংলার বাঙালি জলস্রোতের মতো প্রবেশ করতে থাকে। সমতল ত্রিপুরার (বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত) ছিন্নমূল মানুষেরা চলে আসেন পার্বত্য ত্রিপুরায়, তৎকালীন রাজার আশ্রয়ে। এঁদের নিয়েই ত্রিপুরা যোগ দেয় ভারতে। সমতল আর পার্বত্য ত্রিপুরার মিলনে একসময়ের শান্ত ত্রিপুরা অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠে। ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগ, ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর রাজতন্ত্র ভেঙে অঙ্গরাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তি ইত্যাদি ঘটনা ত্রিপুরার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুকে বিরাট পরিবর্তনের মুখে দাঁড় করায়। রাজতন্ত্রের অবসান এবং গণতন্ত্রের উত্থান, বিপুল উদ্বাস্তুস্রোত ও জনবিন্যাসের চরিত্র বদলে যাওয়ায় ত্রিপুরার জনজীবন স্থির থাকেনি। দাঙ্গা ও দেশভাগের ফলে ত্রিপুরায় অত্যধিক বাস্তুহারা বাঙালির প্রবেশে রাজ্যের শান্ত, জুমচাষ নির্ভর জনজাতি-জীবনে প্রবল অস্থিরতা ও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ত্রিপুরার জনসমষ্টি ভাগ হয়ে যায় উপজাতি ও বাঙালি এই দুই অভিধায়। উদ্বাস্তু জনগণ নতুন ঠিকানার খোঁজে ত্রিপুরার মাটিতেই শেকড় বিস্তার করতে থাকে। সময়ের সঙ্গে জনজাতি মানুষদের সঙ্গে গড়ে উঠে বহুমাত্রিক সম্পর্ক। তৎকালীন ত্রিপুরা রাজ্যে বহুল জনসমাগম সঙ্গে এনেছিল নানা সমস্যা। হৃদয়ের বিনিময়ে সমাজবন্ধন রচনার আন্তরিক প্রয়াসও সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে, অব্যাহত থেকেছে সম্প্রীতির সাধনা। পরবর্তী দশকগুলির নানা সময়ে জনজাতি ও বাঙালির মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠার পাশাপাশি সংকট ও টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়েছে। সৃজনশীল কবি-সাহিত্যিকের রচনায় যার স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়।

(তিন)

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে প্রকৃত আধুনিক কবিতার সূত্রপাত ঘটেছিল পার্বত্য ত্রিপুরায়। ভারতের সঙ্গে যোগদানের পরবর্তী সময়ে রচিত এ রাজ্যের কবিতায় রয়েছে কবিদের অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভবের পোড়া গন্ধ। এ রাজ্যের জনজাতি মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। পাশাপাশি বাঙালি কবিরাও যত্ন ও দরদ দিয়ে কবিতায় তুলে আনেন জনজাতি সমাজের জীবন-সংস্কৃতি, সমস্যা ও সংকটের নানা দিক। ত্রিপুরার বাংলা কবিতা মিশ্র-সংস্কৃতির ভূমিসঞ্জাত। রাজ্যের সাইত্রিশ লক্ষ অধিবাসীর তিন-চতুর্থাংশই ছিন্নমূল বাঙালি। কবিতা চর্চার প্রথম পর্বে অসাধারণ কিছু লেখা না হলেও সেই পর্বের গুরুত্ব হেলাফেলার নয়। অজিতবন্ধু দেববর্মণ, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, মণিময় দেববর্মণ, নুরুল হুদা, সমাচার চক্রবর্তী, কমলপ্রভা দেবী প্রমুখরা ছিলেন পঞ্চাশের দশকের পথিকৃৎ কবি। এঁদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র প্রভাব লক্ষ করা যায়। সে সময়ের প্রধান কবি ছিলেন রণেন্দ্রনাথ দেব, যিনি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায়ও লিখেছেন। যদিও ঐ পর্বের কবিতায় ত্রিপুরার সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনের তেমন কোনো ছাপ ধরা পড়েনি। পঞ্চাশের দশকের কবিদের কবিতায় উদ্বাস্তু জীবনের সংকট, বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা, ত্রিপুরার জনজীবনে তার প্রভাব তেমনভাবে ওঠে আসেনি। নতুন ভূ-খণ্ডকে আপন করে নিতে উদ্বাস্তু বাঙালির সময় লেগেছে। তাই কবিদের লেখায় দীর্ঘদিন উপেক্ষিত থেকেছে রাজ্যের জনজাতি জীবন, তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং এ রাজ্যের সঙ্গে একাত্মতা।

দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাঙালিরা সঙ্গে এনেছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্ভার। ষাটের দশকে এসে ত্রিপুরার বাংলা কবিতা নিজস্ব ভূমি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ত্রিপুরার বাংলা কাব্যচর্চায় গত শতাব্দীর ষাটের দশক তাই অন্যতম উল্লেখযোগ্য দশক। একসঙ্গে বেশকিছু ভালো লিটল ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করে এবং সেখানে লিখতে থাকেন ব্যতিক্রমী ও সাহসী কবিরা। ষাটের দশকের কয়েকজন শক্তিমান কবি হলেন সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, অনিল সরকার, অপরাজিতা রায়, করবী দেববর্মণ, মিহির দেব, স্বপন সেনগুপ্ত, মানিক ধর প্রমুখ। আজ তাঁদের অনেকেই বাংলা কাব্যের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত।

অপরাজিতা রায় মূলত ছড়াকার হলেও কবিতাচর্চাতেও নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন। একজন দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে অন্নহীন, বস্ত্রহীন জনজাতি মানুষের দুঃখ-কষ্টকে তিনি কবিতায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছেন। 'ফুলাংতির থালায় তুলে কবে দেবো ভাত' কবিতায় পাহাড়ি নারী ফুলাংতির দুঃখ–দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি কবির দরদ প্রকাশিত। আদিবাসীদের দুঃখ-কষ্ট, জীবনসংগ্রাম, অভাব-অনটন ইত্যাদি বিষয় দক্ষ শিল্পীর মতো তুলে ধরেছেন কবিতায়।

এ বছরে খরা শুধু
বুনো আলু মাটি খুঁড়ে তুলে দুটি হাত
চঙপ্রেঙ-এর কান্না শুনে চমকে উঠি কাঁদি সারারাত।[২]

অরণ্য-পাহাড়ে ঘেরা ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতির দৈনন্দিন জীবন আন্তরিকতার সঙ্গে স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়। ত্রিপুরার জনজীবন, প্রাকৃতিক সুষমার বর্ণনা তাঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে।

বাঁশে গড়া সোনালী টংঘর,
তার জাফরী ঘেরা বারান্দায়

পাহাড়ী মেয়ের নিটোল ফর্সা গলা ঘিরে
পেঁপের কালো বীচি দিয়ে
নিজের হাতে গাঁথা মালা।

. . .

শহরে ধোঁয়াধুলো নর্দমা পেরিয়ে
আমরা পেয়ে গেলাম
গামছা দিয়ে ছড়ার জলে মাছধরা
কুকীছড়ার শিমূলগাছে থোকা থোকা ফুল
মগডালে ময়নার বাসা।[৩]

কবি অনিল সরকার ত্রিপুরার একজন প্রথিতযশা কবি ও ছড়াকার। মার্ক্সীয় চেতনায় বিশ্বাসী এই কবি ত্রিপুরার রাজনীতির (সি পি আই) সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। নিম্নবর্গের মানুষ তাঁর স্বজন, সহচর। ত্রিপুরার নদী-অরণ্য, পাহাড়-প্রান্তর ও মানুষ তাঁর জীবন ও কবিতার প্রধান অবলম্বন। একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হবার সুবাদে তিনি পাহাড়-প্রান্তরের মানুষের কাছাকাছি যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের প্রতিদিনকার জীবনের দুঃখকষ্ট, বেঁচে থাকার লড়াই। এই কবি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা প্রত্যক্ষ করেছেন তারই বাস্তবচিত্র তুলে এনেছেন কবিতায়। প্রান্তবাসী আদিবাসী নারীর বেদনায় কবির অন্তরেও ঘটেছে রক্তক্ষরণ। তাই তো তিনি লিখতে পারেন—

পূর্ণশ্রী ত্রিপুরা শ্রীমতীর মতো নারী ছিলেন সেদিন
আর কাল সে-ই হাত পেতেছিল
করুণ প্রার্থনায়, বাবু ভাত খামু
মন্ত্রী রাঙ দে
কাপড় সরিয়ে দেখিয়েছিল খালি পেট
ভাতে মরে আছে কতদিন, আহা।[৪]

পাহাড়ি-বাঙালি মৈত্রী বন্ধনের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে ত্রিপুরায়। বাঙালি কবিরা যত্ন ও দরদ দিয়ে আদিবাসী জীবনকে সাহিত্যে রূপদান করেছেন। পাশাপাশি অবস্থানের ফলে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের সম্পর্কে মাঝে মাঝে ফাটল দেখা দিলে সংবেদনশীল কবিরা লেখনীর দ্বারা সেই ফাটল ভরাটের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পঞ্চাশ-ষাটের দশক পেরিয়ে সত্তরের দশকে বাঙালি ও জনজাতির সম্পর্কে টানাপোড়েন, তিক্ততা, অবিশ্বাস বেড়ে যায়। রাজনৈতিক কূটকচালীতে যা কদর্য চেহারা নেয়। ধীরে ধীরে 'ভূমিপুত্র' নামক একটি বিতর্কিত বিষয়েরও উদ্ভাবন হয়, যা বাঙালি ও জনজাতি মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের সুতো দিয়েছিল কেটে। তারপরই বদলে যেতে থাকে ত্রিপুরার ইতিহাস। জনজাতি গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থরক্ষার জন্য বাঙালি বিতাড়নের মাধ্যমে বাঙালি মুক্ত 'স্বাধীন ত্রিপুরা' গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। আদিবাসী সমাজের একাংশের যুবক যুক্ত হতে থাকে বিচ্ছন্নতাবাদী সংঘটনে। বিভেদ-বিচ্ছেদের দেওয়াল উঁচু হতে থাকে। জন্ম নেয় পারস্পরিক হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ ও অবিশ্বাস, যার পরবর্তী ইতিহাস রক্তাক্ত ইতিহাস।

একদল বিচ্ছিন্নতাবাদী বিপথগামী মানুষ জাতি-জনজাতির দীর্ঘদিনের প্রতি-মৈত্রী ধ্বংস করে হত্যালীলায় অবতীর্ণ হয়। পরবর্তী দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলে সেই ভয়াল সময়। ত্রিপুরার কবিদের কবিতায় অঙ্কিত হয়েছে সেই ভয়াল পরিস্থিতির ছবি। কবি অনিল সরকারের 'কার্তুজের খোল' কবিতায় গ্রাম ত্রিপুরার এক বিষাদান্তক চিত্র লক্ষ করা যায়।

সহচর যুবকেরা খোলা পিঠে বয়ে নিত
বুনো শূকরের অর্ধদগ্ধ লাশ
ছড়ার ওপাড়ে গঞ্জের সাপ্তাহিক হাট বসে।
এখন এখানে পড়ে আছে কার্তুজের খোল
বাতাসে বারুদের গন্ধ, গাছের আড়ালে
হাওয়ায় শিস দেয় হননের উন্মত্ত ট্রিগার
এখানে ওখানে রক্তের দাগ শুকায়।[৫]

কবি অনিল সরকার কবিতাকে শুধু শিল্প-মাধ্যম হিসেবে দেখেননি। কবিতাকে তিনি একাধারে মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণা ও প্রতিবাদের ভাষা করে তুলতে চেয়েছেন। সত্তর আশির দশকের ত্রিপুরার মাটি যখন উগ্রপন্থী সমস্যায় জর্জরিত, সে সময় তাঁর সৃষ্টিশীল কলম থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী।

ত্রিপুরার অন্যতম জনপ্রিয় কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী। তৎকালীন সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা তাঁকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল। অনিশ্চয়তায় ভরা এক বিপন্ন ত্রিপুরার ছবি ধরা পড়ে তাঁর কবিতায়। দীর্ঘদিনের সম্প্রীতির সাধনার পরও জাতি-জনজাতির সম্পর্ক একসময় তিক্ততায় ভরে ওঠে। একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হয়। সমতল ও পাহাড়ের জীবন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বাড়িঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিতে থাকে মানুষ। আগুনে পুড়তে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। 'জন্মদিন' কবিতায় কবি এঁকেছেন সে ছবি—

নদীর রেলিং-এ এসে থেমে থাকে
জঙ্গলের অন্ধকারে বসে থাকে বিপন্ন মানুষ
কেউ বন্ধুক হাতে নিয়ে, কারো কলে শিশু,
ভীত, শব্দহীন।[৬]

সৃষ্টিশীল কবি-সাহিত্যিক সন্ত্রাসবাদকে কখনোই সমর্থন করেন না। এক্ষেত্রে ত্রিপুরার কবিরাও ব্যতিক্রমী নন। ত্রিপুরাতে দীর্ঘ সময় ধরে (প্রায় আড়াই দশক) সন্ত্রাসবাদ ভয়ংকরভাবে সক্রিয় ছিল। এই সন্ত্রাসবাদকে কবি কল্যাণব্রত চক্রবর্তী উপরে উপরে বিচার করেননি। সমস্যার গভীরে অভিজ্ঞ দৃষ্টি ফেলে তার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। অস্থির বিপন্ন মানুষ ও সময়ের চিত্র এঁকেছেন 'বৈরী' কবিতায়।

সবুজ টাইগার এসে হানা দেয়
সশস্ত্র জঙ্গলে ভরা রাত
কবন্ধে সোনার হার গুঁজে দিয়ে
আদিবাসী বালিকারা
কাঁথা মেলে উদ্বাস্তু শিবিরে।[৭]

'সিন্ধুকুমারে যাবার আগে' কবিতায়ও অঙ্কিত হয়েছে উত্তাল ত্রিপুরার ছবি। নিজেকে বাঁচাতে অসহায় বিপন্ন মানুষ রাতের পর রাত জঙ্গলে আত্মগোপন করে থেকেছে।

সিন্ধুকুমারে যাবার আগে
মাঝরাতে আবার পুড়ছে গ্রাম, পাড়াশুদ্ধ লোক
কে কোথায় জঙ্গলে পালিয়েছে; কাঁদবে ভয়ে
বজ্রমুঠিতে ছেলের মুখ ছেপে আছে মা,
...
তাও কি বাঁচা যায়? আশ্রয় শিবিরে ঢুকে

নির্বিচারে গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, ঘরের ছেলেরা
এখন ঘাতক হয়েছে...।[৮]

এছাড়াও কবি তাঁর 'মণিরুং রিয়াং', 'স্বদেশ', ইত্যাদি কবিতায় অত্যন্ত যত্ন ও দরদের সঙ্গে তুলে ধরেছেন আদিবাসী জীবনের নানা অনুষঙ্গ।

জনপ্রিয় কবি সেলিম মুস্তাফার কবিতায় তৎকালীন ত্রিপুরার অস্থির পরিস্থিতির ছবি অঙ্কিত হয়েছে। কবি আশির দশকের প্রত্যক্ষ চিত্র তুলে এনেছেন। ত্রিপুরার জাতিদাঙ্গা, উগ্রপন্থী সমস্যা, পাশাপাশি অবস্থান করেও জনজাতি ও বাঙালির মধ্যেকার অবিশ্বাস ও হিংসার রূপটি তাঁর কবিতায় ওঠে এসেছে। 'মানুষের পায়ের কাছে' কবিতায় আছে ১৯৮০ সালের ভয়ংকর সময়ের ছবি—

অবিশ্বাসের আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল এদিকেও
আমরা ডেকে তুললাম যে যার ভাইকে, বললাম
জেগে থাকো।
লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল সমস্ত ইস্কুলবাড়ি
ময়দান ঘাড় গুঁজে ঢুকে গেল তাঁবুর ভেতর...।[৯]

অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তার মুখে কীভাবে আদিবাসী বাঙালির পারস্পরিক প্রীতি-ভ্রাতৃত্বের অপমৃত্যু ঘটেছে, আলোচ্য কবিতাটি সেই সাক্ষ্য বহন করে। 'লাশ' শব্দটি বারবার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পরিস্থিতিতে মৃত্যুর অনিবার্যতাকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন কবি।

অ্যাম্বুলেন্স টেলিফোন আর
ফায়ার ব্রিগডে তবে এ-সংসার ভরে গেল কেন?
আমি জানি উত্তর,
এখন সকলেই জানে, তবু বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে
লাশের পর লাশ লাশের পর লাশ লাশের পর লাশ
উড়ে আসছে লাশ
ভেসে আসছে লাশ
গড়িয়ে নেমে আসছে মানুষের পায়ের কাছে
মানুষের ভাই
তার লাশ।[১০]

ত্রিপুরার অরণ্য-পাহাড়-সমতলে বসবাসকারী মানুষের জীবনচিত্র গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়। পাহাড়ি মানুষের কথা, তাদের অরণ্যনির্ভর জীবন-কাহিনি, দুঃখ-দারিদ্র্য, বিবাহ, প্রেম, ক্ষুধা, আর্থিক টানাপোড়েন, রাজনৈতিক আস্থা ইত্যাদি তিনি নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন। শহুরে বাবুদের লোভ-লালসার কারণে পাহাড়ি ফুলের মতো কুমারী মেয়েদের অপমৃত্যু হয়েছে। কবির সচেতন লেখনী বিষয়টিকে কবিতায় তুলে আনে অবলীলায়। অরণ্যনির্ভর আদিবাসী জীবনের সংকট-সমস্যাকে রূপ দিতে গিয়ে দাঙ্গাবিধ্বস্ত সন্ত্রাস কবলিত ত্রিপুরার বাস্তব চিত্র এঁকেছেন কবি।

(চার)

ত্রিপুরার বাঙালিদের অস্তিত্ব সংকটের কথা আছে কবি নকুল রায়ের কবিতায়। জন্মসূত্রে ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও পদে পদে ত্রিপুরার বাঙালিকে বহিরাগত হিসেবে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। ফলে নিজ রাজ্যে পরবাসী হওয়ার মধ্যে যে অব্যক্ত যন্ত্রণা রয়েছে 'জন্মসূত্রকথা' কবিতায় কবি নকুল রায় তা তুলে ধরেছেন।

যদিও এ শুধু ত্রিপুরার বাঙালির সমস্যা নয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাঙালিরা এরূপ অস্তিত্বের সংকট নিয়েই বেঁচে আছে।

ত্রিপুরার বাংলা কবিতাচর্চার জগতে রাতুল দেববর্মণ একটি জনপ্রিয় নাম। তাঁর কবিতায় আমরা আদিবাসী ও বাঙালির মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা লক্ষ করি। কবি 'শাখানটাঙের অবাক বালক' কবিতায় আদিবাসী-বাঙালির মিশ্র-ঐতিহ্যকে দেখাতে চেয়েছেন। যেখানে আদিবাসী যুবক পাহাড়ের চূড়ায় বসে তার ব্যাঞ্জোতে (বাদ্যযন্ত্র) ভাটিয়ালি সুর তোলে। আমরা জানি, নদীমাতৃক গ্রামবাংলার ভাটি অঞ্চলে ভাটিয়ালি সুরের উৎপত্তি। পার্বত্য ত্রিপুরার মনু-গোমতীর মত ছোট, মধ্যম গতির পাহাড়ি নদীতে ভাটিয়ালি সুরের জন্ম হয়নি। উদ্বাস্তু বাঙালিরা ত্রিপুরায় সে সুর সঙ্গে এনেছিলেন, যা সময়ের সঙ্গে মিশে গেছে এ রাজ্যের সুরের জগতে। দীর্ঘসময় ধরে একে অন্যের প্রতিবেশী হিসেবে বসবাসের ফলে সংস্কৃতির যে মিশ্রণ ঘটেছে ত্রিপুরায়, আলোচ্য কবিতাটি সে ঐতিহ্যকেই স্পষ্ট করে। কবি রাতুল দেববর্মণ ত্রিপুরার সেই মিশ্র-ঐতিহ্যের স্বরূপ ধরতে চেয়েছেন কবিতায়।

'শাখানটাঙ'-এর চূড়ায় বসে অবাক বালক
বাজায় ব্যাঞ্জো তার ভিতরে ভাটিয়া সুর
ভরা নদী দূরে কোথাও নৌকা দোলায়
সে চিনছে গোমতী ও মনুর দোলা
তার কলিজায় সুরের এবং মাটির আগুন
জ্বলে পুড়ে এই দুপুরে ওই পাহাড়ে।[১১]

আশির দশকের কবিতায় ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড়-অরণ্য প্রাধান্য পেয়েছে। আবহমানকাল ধরে চলে আসা ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির নন্দনকাননে আশির দশকে ভয়াবহ বিভেদের দেয়াল তৈরি হয়েছিল। আশির দশকের কবি সাহিত্যিকেরা সেই বিপন্নতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই দশকের উল্লেখযোগ্য কবি শঙ্খশুভ্র দেববর্মণের কবিতা ত্রিপুরার জল মাটি ও রাজ্যের মানব বৈচিত্র্যের প্রকাশে উজ্জ্বল। তাঁর কবিতায় উঠে আসে ত্রিপুরার প্রাচীন লোককথা, দেবদেবী ও পাহাড়ি জীবনের নানা অনুষঙ্গ।

আশির দশকের কবি মণিকা বড়ুয়া। সে দশকে গ্রাম-পাহাড়ে, শহর-অরণ্যে মানুষের বিশ্বাস ভেঙে গেছে। অস্থির সময়ের পুঞ্জীভূত সেই আশঙ্কার কথা, সংশয়-সন্দেহে ভরা আদিবাসী-বাঙালি সম্পর্কের স্বরূপ ফুটে উঠেছে তাঁর 'হে সম্পর্ক' কবিতায়। কবি লিখেছেন—

পাহাড়ে যাই। সম্পর্কের কথা বলি।
ওরা চিনতে পারে না।
. . .
টংঘরে উঠি। হাঁফাতে থাকি। টানের কথা বলি।
ওরা আড়চোখে চায়।
বনের পথে হাঁটি। শৈশব ও তারুণ্যের কথা বলি।
ওরা সন্দেহপ্রবণ।[১২]

আশির দশকের ত্রিপুরায় পাহাড়ি-বাঙালির সম্পর্ক ছিল অবিশ্বাস ও তিক্ততায় ভরা। হত্যা, ষড়যন্ত্র, অপহরণ, মুক্তিপণ ও বন্দুকের মুখে রক্তাক্ত ত্রিপুরা তখন ভিন্ন চেহারা নিয়েছিল। কবি বিশ্বজিত দেব তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন ভয়ার্ত-অরণ্য-পাহাড়-সমতলের কথা। পাহাড়ের ভয়াবহ পরিণতি, অস্তিত্বের

টানাপোড়েন ও সংকটক্লান্ত পাহাড়ি জীবনকে জানাবার আগ্রহ আশির দশকে বেশি দেখা যায়। ত্রিপুরার আদিবাসী-বাঙালি সম্পর্কের সংকট ও স্বরূপ বারবার চিত্রায়িত হয়েছে কবি বিশ্বজিতের কবিতায়।

নব্বইয়ের দশকের কবি আকবর আহমেদের কবিতায় ত্রিপুরার আঞ্চলিক রূপ প্রতিভাত হয়। পাশাপাশি অবস্থানের ফলে আদিবাসী বাঙালির ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মভাবনা সবকিছু মিলেমিশে গেছে। কবি আকবরের কবিতায় রয়েছে সেই মিশ্রণের স্বাদ। তাঁর কবিতায় 'শব্দ' ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি বিনা দ্বিধায় বাংলা কবিতায় ব্যবহার করেন আদিবাসী শব্দ। যেমন— গোদক, খারপানি, জুম, করুল, মুড়া।। ত্রিপুরার মিশ্রসংস্কৃতি তথা আঞ্চলিক চেহারাকে তুলে ধরে তাঁর কবিতা।

(পাঁচ)

ত্রিপুরা রাজ্যে জনজাতি ও বাঙালির সম্প্রীতির ইতিহাস বেশ প্রাচীন। তা সত্ত্বেও দেশভাগ পরবর্তী সময়ে নানা কারণে সে সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে। উদ্বাস্তুর আগমনে আদিবাসীদের মধ্যে জমি হারানোর আশঙ্কা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে জনজাতি সমাজের একাংশ উগ্র-জাতীয়তাবোধের শিকার হয়। তাছাড়া জীবন-জীবিকার নানা ক্ষেত্রে বাঙালির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে থাকে জনজাতি সমাজ। কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলের চক্রান্তে তখন পদদলিত হয়েছে আদিবাসীদের অধিকার। ফলে তাদের মধ্যে অশান্তি-অস্থিরতা বাঁধতে থাকে এবং একসময় ভয়ংকর বাস্তবের রূপ ধারণ নেয়। ত্রিপুরার সংবেদনশীল কবিরা তাঁদের কবিতায় তুলে ধরেছেন সেসব ইতিহাস। তাঁদের রচনায় উদ্বাস্তু বাঙালি জীবনের অনিশ্চয়তার পাশাপাশি আদিবাসী সমাজের সংকটের কথাও এসেছে। আর প্রাধান্য পেয়েছে সম্প্রীতি গড়বার প্রয়াস। বর্তমান তরুণ কবি, যাঁদের জন্ম ও বেড়ে উঠা ত্রিপুরায়, তাঁদের লেখালেখির মূল অবলম্বন ত্রিপুরার জল, মাটি, আবহাওয়া ও মানুষ। ত্রিপুরায় বাংলার পাশাপাশি ককবরক, চাকমা, মগ, মণিপুরী ভাষায়ও কাব্যচর্চা হচ্ছে। সর্বোপরি, সম্প্রীতি ধরে রাখার যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু মানুষের 'স্বাধীন ত্রিপুরা' গড়বার স্বপ্ন মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। স্বতন্ত্র 'তিপ্রা ল্যান্ড'-এর দাবীতে অস্থির-বিশৃঙ্খল রূপ নেয় আপাত শান্ত পার্বত্য ত্রিপুরা।

সূত্রনির্দেশ:

১) জয়ন্ত ত্রিপুরা, সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা, দৈনিক সংবাদ পাবলিশার্স, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃ-৩৫
২) মিলনকান্তি দত্ত (সম্পাদক), উত্তর পূর্বাঞ্চলের মহিলা কবিদের বাংলা কবিতা, স্রোত প্রকাশনা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ-৭৮
৩) তদেব, পৃ-৮২
৪) অনিল সরকার, ব্রাত্যজনের কবিতা, জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৮, পৃ-৪৫
৫) তদেব, পৃ-১৭
৬) মৃণালকান্তি দেবনাথ (সম্পাদক), অশ্রুত (পত্রিকা) কল্যাণব্রত চক্রবর্তী সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ-২৩
৭) তদেব, পৃ-২৯
৮) তদেব, পৃ-৩০

৯) কাকলি গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক), আবৃত্তির কবিতা, ত্রিপুরা পর্ব, ভাষা, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ-২০১৩, পৃ-১২৭
১০) তদেব, পৃ- ১২৭
১১) রাতুল দেববর্মণ, শাখানটাঙের অবাক বালক, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮,পৃ-১৪
১২) মিলনকান্তি দত্ত (সম্পাদক), উত্তর পূর্বাঞ্চলের মহিলা কবিদের বাংলা কবিতা, স্রোত প্রকাশনা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ-১১৭

সহায়ক গ্রন্থ:

১) অভিজিৎ চক্রবর্তী, ত্রিপুরার বাংলা কবিতা, নীহারিকা, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭
২) অনিল সরকার, ব্রাত্যজনের কবিতা, জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৮
৩) কাকলি গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক), আবৃত্তির কবিতা, ত্রিপুরা পর্ব, ভাষা, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ-২০১৩
৪) কল্যাণব্রত চক্রবর্তী (সম্পাদক), ভাষাসাহিত্য (পত্রিকা), আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব বিশেষ সংখ্যা, আগরতলা ২০১২
৫) জয়ন্ত ত্রিপুরা, সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা, দৈনিক সংবাদ পাবলিশার্স, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ২০০১
৫) নির্মল দাশ, রমাপ্রসাদ দত্ত (সম্পাদক), শতাব্দীর ত্রিপুরা, অক্ষর পাবলকেশনস, আগরতলা, ত্রিপুরা, পরিমার্জিত, পরিবর্তিত সংস্করণ ২০১৬
৬) মিলনকান্তি দত্ত (সম্পাদক), উত্তর পূর্বাঞ্চলের মহিলা কবিদের বাংলা কবিতা, স্রোত প্রকাশনা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩
৭) মুকুল কুমার ঘোষ, ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চার সেকাল একাল, ত্রিপুরা দর্পণ, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ২০১১
৮) মৃণালকান্তি দেবনাথ (সম্পাদক), অশ্রুত (পত্রিকা), তৃতীয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুন ২০১৬
৯) ঐ, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
১০) মৃণালকান্তি দেবনাথ (সম্পাদক), ত্রিপুরার সাহিত্য অতীত থেকে সাম্প্রতিক, ডি সী বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪
১১) রাতুল দেববর্মণ, শাখানটাঙের অবাক বালক, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮
১২) শিশির কুমার সিংহ, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতক, অক্ষর পাবলিকেশানস, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮
১৩) স্বপন সেনগুপ্ত (সম্পাদক), উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯